মালশ্রী

সাবিত্রী রায়

লোকনদী

পুনশ্চ

॥ সাবিত্রী রায় : আমাদের অন্বেষণ ॥

যে কোনো কথাকারই লেখেন আসলে নিজের সময়কে। যে কাল আর স্থানের মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীকে পার হয়ে যাচ্ছেন তার নিজস্ব বিবরণই ঔপন্যাসিকের বিষয়। এক একজনের বলার ভঙ্গী এক এক রকম কিন্তু সকলেই তাঁরা সময়চিত্রী।

সাবিত্রী রায়কে আমরা পাই সেই কথক হিসাবে যিনি নিজের জীবিতকালকে বিবৃত করছেন প্রায় ঘটমান বর্তমানের ধরণে। মাত্র ২৮ বছর বয়সে লেখা হয়ে যাচ্ছে তাঁর প্রথম উপন্যাস—সৃজন। আদর্শবাদী স্বপ্নিল জীবন থেকে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বাস্তবের সঙ্গে যে পরিচয়, সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিঘাতকে লিপিবদ্ধ করছিলেন সাবিত্রী। আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে বারে বারে আদর্শের অপলাপ কখনই সমাজে অজানা ছিল না। বিশেষত দীর্ঘকাল একটি অত্যাচারী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে টিকে থেকে যান যে মধ্যবিত্ত স্থিতিশীল মানসিকতার লোকজন, যে কোনো পরীক্ষার সামনে পড়লেই ঘোষিত আদর্শ থেকে সরে এসে নিরাপদ অবস্থার সঙ্গে আপোষ করে নেওয়া তাঁদের পক্ষে বিরল নয়। সেই আপোষ কেবল ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা বস্তুগত লাভ-লোকসানের জন্য নাও হতে পারে, কোনো সামাজিক স্থিতাবস্থা যা মেনে চলা 'কম ঝমেলাজনক' অথবা অপেক্ষাকৃত দুর্বলজনের প্রতি কিঞ্চিত সহানুভূতি বা মর্যাদা কম দেখালে যদি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোকে সহজে ব্যবহার করা যায়, সেরকম ক্ষেত্রেও এই আপোষ ঘটে। চিরকালই ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে যে দুর্বল জন একসময়ে ক্ষমতার শিকার হন, তিনি সেখানে প্রতিবাদ করতে না-পেরে বরং নিজেও অন্য দুর্বলের ওপর নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করেন একই ভাবে। আমরা বাস্তবে এরকমই দেখতে অভ্যস্ত। এভাবেই পিতৃতন্ত্রর দুর্বলদেরও ওপর ভর করে টিকে থাকে।

সাবিত্রী ঠিক এভাবে জীবনকে নিতে চাননি। তখনও একটি সাধারণ মেয়ের জীবনে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা ছিল তার বিবাহ। সাবিত্রী আদর্শমুগ্ধ হয়ে সেই বিয়ে স্থির করেন নিজে। কিন্তু তারপর প্রতিপদে স্বপ্নভঙ্গ হতে থাকে তাঁর। লক্ষ লক্ষ মেয়ে এরকম বহু স্বপ্নভঙ্গকে 'স্বাভাবিক' বলেই মেনে নিতেন বা হয়তো আজও

নিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে সেই একই রকম দিন কাটানো লক্ষ লক্ষ মেয়ের থেকে সাবিত্রী যেখানে বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন তা তাঁর আশ্চর্য মনন ও চরিত্রের দৃঢ়তা। যা তিনি দ্বিচারিতা বলে মনে জেনেছেন, জেনে কষ্ট পেয়েছেন, তাকে সহজ বা নিরাপদ বলে কখনও মেনে নেন নি। একজন সংস্কারমুক্ত সামাজিক কর্মী নিজের বাড়ির অযৌক্তিক আচারবিচার মেনে চলেন, একজন বিজ্ঞানকর্মী আঙুলে রঙিন পাথরের আংটি পরেন, একজন নারীস্বাধীনতার প্রবক্তা নিজে ছেলের বিয়েতে পণ নেন-এসব দেখতে আমরা অভ্যস্ত, মেনে নিতেও। হয়তো আজকেও সমাজের দুর্বলতর বা নিরাপত্তাপ্রয়াসী মানুষরা এগুলির সঙ্গে বাস করতে নিজেদের অভ্যস্ত করেন। আশি বছর আগেকার একটি মেয়ে বাস্তবে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন নি কিন্তু অনেক গভীরে, অনেক স্থায়ীভাবে সেই প্রতিবাদ জানানোর ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন। লেখক হয়ে উঠলেন সাবিত্রী আর লিখে চললেন নানান বৈষম্যে ভরা নিজের প্রত্যক্ষ চারিপাশকে। 'সৃজন', তার দুবছর পরে সন্তান জন্মের একবছরের মাথায় 'ত্রিস্রোতা', তার তিন বছর পর 'স্বরলিপি'। পারিবারিক নানা চাপ, সদ্যপ্রসূতি একটি মেয়ের তীব্র মানসিক টালমাটাল, শিশুর দায়িত্ব—একটি মেয়ের জীবনে এই সময়টা যে কতখানি সংকটময়, সেকথা তৎকালীন সমাজে বোঝার চল ছিল না। অন্যদের বাদ দিলেও এমনকি যাঁকে অবলম্বন করে নতুন জীবনে ভাসা, সেই মানুষও অচেনা-প্রায়। তথাকথিত প্রগতিবাদী শিক্ষিত বন্ধুরা অদ্ভুত রকম সহানুভূতিহীন, এমনকী বিদ্রূপাত্মক। তারও মধ্য দিয়ে নিজের লেখিকাসত্তাকে কীভাবে বাঁচিয়ে চলেছিলেন সাবিত্রী, কোন নিঃশব্দ জেদে-তাঁর লেখাতে সে বিবরণ তিনি খোদাই করে রেখে গিয়েছেন।

যদি কেবল একটি মেয়ের নিজস্ব বেঁচে থাকার কাহিনিই লিখতেন সাবিত্রী, তাতেও বাংলাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন তাঁর থাকত, সেই সময়ে বসে এমন ঘোমটাছাড়া নির্মোহ লেখা সৃষ্টি করার জন্য। মধ্যবিত্ত সমাজের অনেককটি প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখা আর পাঠককে তা দেখানোর জন্য। পরিস্থিতির বৈচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে কত বিচিত্র চরিত্রর জীবন্ত হয়েছে সাবিত্রীর কলমে। তরুণবয়সে বিশাল কোনো পাঠের সুযোগ পেয়েছিলেন সাবিত্রী, এমন সাক্ষ্য মেলে না। সাংসারিক পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে খুব কোনো অবাধভূমি ছিল বলেও মনে হয় না। তাঁর বাইরে যাওয়া যেন রবীন্দ্রনাথের বিনুর মতো, রোগের দাপটে 'করলে যখন অস্থি জরজর/তখন বললে হাওয়া বদল করো'। তবু সেই অতটুকু ফাঁকা দিয়েই যেন কতখানি দেখেছেন তরুণীটি আর, দেখিয়েছেন পাঠককে। ষাট বছরেরও কম স্থায়ী এক জীবন, তারও শেষ ষোলোবছর কিছু লেখেন নি, মোটামুটি কুড়ি কি পঁচিশ বছরের লেখক জীবনেও সার্থকতার এক উঁচু মাত্রা ছুঁয়েছিলেন সাবিত্রী, এমনকি কেবল মধ্যবিত্ত সমাজ তার মূল্যবোধ আর

দ্বিচারিতা, তার মধ্যে ক্ষমতা-রাজনীতির স্পষ্ট রূপায়ণ, তাঁর চোখে সেই বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর সময়েও এমনভাবে ধরা পড়েছিল যা আমরা তাঁর সমকালীন বাংলা লেখকদের প্রায় কারো মধ্যে দেখিনা। সেই সময়ের পুরুষ লেখকদের মধ্যে অবক্ষয়ের যে ছবি পাওয়া যায়, তা প্রধানত সামাজিক ক্ষয়কে বাইরের দিক থেকে দেখায়। সাবিত্রীর লেখা প্রান্তিকের মধ্যেও প্রান্তিক মানুষের দৃষ্টি থেকে। ফলে নিত্যজীবনের সেই ক্ষয়ের ছবি সাবিত্রী দেখেছিলেন যা পঞ্চাশ-ষাট বছরের উত্তরকালে তীব্রভাঙন হয়ে দেখা দেয়।

তবু, ব্যক্তিগত জীবনের আয়নায় সমাজের বৃহৎভাঙচুরকে ধরাই সাবিত্রী রায়ের লেখার মূল জায়গা নয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। বিশ্বযুদ্ধকালের ও তার পরবর্তী বৃহত্তর বাংলার যে বিপুল পরিবর্তন, গার্হস্থ্যজীবনের ওঠাপড়ার পাশাপাশি সমগ্র পরিপার্শ্বে সেই প্রতিফলনের বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ দেখা আর তাকে পাঠকের সামনে অনুপুঙ্খে ধরে দেওয়ার যেন বা তথ্যপত্র তৈরির কাজটিও করে চলেছিলেন তিনি। আজকের কালের পঠনে কারো কারো মনে হতেই পারে যে বড়ো বেশি অনুপুঙ্খ সেই বিবরণ, বড়ো অসংখ্য চরিত্রে তাঁর প্রেক্ষাপট সমাকীর্ণ। সেখানে পাঠককে তো মনে রাখতেই হবে তাঁর কাল, পঠনসময়ের ফ্রেমে বৃহৎ উপন্যাস তখনও অনভ্যস্ত হয়ে যায়নি; বিশ্বসাহিত্যের যে অলিন্দটির সঙ্গে সাবিত্রীর পরিচয় অপেক্ষাকৃত বেশি, তা রুশ উপন্যাস এবং সর্বোপরি, ভাগ্যিস লিখেছিলেন অতখানি বিস্তারে! আজ যখন আমাদের মতো কোনো আগ্রহী ছাত্রী সেই সময়ের সাধারণ মানুষজনের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিবরণ খুঁজে দেখতে চাই, বিশেষত দেশভাগের অব্যবহিত আগে-পরে নতুন ভূঁইয়ে এসে পড়া সংসারগুলির বিবরণ, তখন ওই বিশাল বিস্তারই প্রায় সিংহাবলোকনে দেখা মানচিত্রের মতো কাজ দেয় যেখান থেকে কাছে এসে দেখা সম্ভব হয়।

নানাদিক দিয়ে বিচার করে 'মালশ্রী'কে সাবিত্রী রায়ের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্র বলে মনে হয়। তাঁর অন্য উপন্যাসগুলির তুলনায় এখানে কাহিনি অনেকখানি সংহত। মূলত একজন মেয়ে—তার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য জমি খোঁজা ও আত্মনির্মাণের কাহিনি 'মালশ্রী'। বহু চরিত্র এখানেও, তবু তারা নানাদিক থেকে রাখীকেই প্রতিফলিত করে, রাখীর মানসিক টানাপোড়েন আর আশ্রয়সন্ধানকে গভীরতর ভাবে ফুটিয়ে তুলতেই তাদের অবতারণা। তাঁর অন্য উপন্যাসগুলিতে দাম্পত্যপ্রেম যেভাবে উপস্থিত, যা কেবলি প্রায় একতরফা সমর্পণ ও নিঃশব্দে ব্যথা পাওয়ার উপাখ্যান সেই নকশা কিছুটা ভেঙে যায় এই উপন্যাসে। এখানে অন্যান্য বহু চরিত্রের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে অন্য প্রতিবেশ থেকে এসে পড়া লেখক দিগন্ত, যে রাখীর অন্তর্লীন মনোবেদনা আর সম্ভাবনাকে দেখতে পায়। সাম্য রাখী ও দিগন্তের

মধ্যে একটি অলোক ত্রিভুজ গড়ে ওঠে যা কোনো 'স্বাভাবিক' ঈর্ষাকাতর ত্রিকোণ প্রেমের উপাখ্যানের বদলে 'মালশ্রী'-কে করে তোলে মানসিক সঙ্গহীনতায় কাতর এক লেখকের নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সাহসিক উপাখ্যান। যে সঙ্গ রাখীর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তা হল সহমর্মিতা, মর্যাদা স্বীকৃতি-কেবল নারী হিসাবে নয়, সৃজনশীল মানুষ হিসাবে। দিগন্ত সেইখানে তার পাশে এসে দাঁড়ান নিজের সংবেদী উপস্থিতি নিয়ে। সাবিত্রীর অন্যান্য উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসটিতেও নরনারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে রোমান্টিকতার স্থান প্রধান। তার কারণ বোঝাও কঠিন নয়। তবু 'মালশ্রী' তে একটি সৃষ্টিশীল মেয়ের মনোভুবনকে প্রকাশ করতে যে সাহস দেখান, লেখিকা তা খুব সাধারণ নয়।

নিজের সময়ের চেয়ে অনেকখানি ব্যতিক্রমী এই পূর্বমাতৃকাকে খুঁজে নেওয়া, তাঁকে পাঠকের সঙ্গে আর-একবার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার বহুদিনের। এ বিষয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি পাশে থেকেছেন তিনি গার্গী চক্রবর্তী—লেখিকার একমাত্র কন্যা। মায়ের লেখাগুলির সঙ্গে কেবল জড়িয়ে থাকাই নয়, দীর্ঘকাল সেগুলিকে বুকে করে রেখেছিলেন বলে আজ আবার সেই বই ছাপার কথা ভাবা যাচ্ছে। সুখ্যাত প্রকাশনা 'পুনশ্চ'-র তরুণ প্রকাশক সন্দীপ নায়ক নিজে এগিয়ে এসে এই বই প্রকাশ করার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন। পুরোনো পাঠকদের পাশাপাশি, বরং বেশি করেই, নতুন সাহিত্য পাঠকেরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এই পুনরাবিষ্কারের কাজে। তবে সেও সম্ভব হয়ে উঠত না পূর্বোল্লেখিত দুই সুজনকে ছাড়া।

এরপর প্রতীক্ষা রইল পাঠকদের, গবেষকদের, অনুসন্ধিৎসুদের সকাশে। তাঁরা ফিরে দেখুন নিজেদের ইতিহাসের এক কালখণ্ডের মুখ।

সবিনয়ে
জয়া মিত্র
বৈশাখ, ১৪২৬

॥ আমার চোখে মা : অন্তঃসলিলার নায়িকা ॥

গার্গী চক্রবর্তী

গোপালপুরের বালুতটে সমুদ্রের দুরন্ত বাতাসের হাতছানি। মায়ের হাত ধরে পাঁচ বছরের একটি মেয়ে। সেইতো আমি। পরে তাকে খুঁজে পেলাম মার লেখা 'মালশ্রী' উপন্যাসের নায়িকা রাখীর কন্যা ডালিয়ার মধ্যে। 'ডালিয়া বালু দিয়ে খেলতে খেলতে হঠাৎ কি খেয়ালে ছুটে চলে সমুদ্রের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকটি ছুটে যায় পিছু পিছু। ডালু মজা পেয়ে আরও জোরে ছোটে। ছোট্ট ছোট্ট হালকা পায়ে ঘাড় ছড়ান ঝাঁকড়া চুলের ঢেউ খেলিয়ে চার বছরের শিশু খেয়ালি আনন্দে ছুটছে ঢেউয়ের দিকে। ওই ভদ্রলোক ডালিয়াকে দু-হাতে পাঁজা কোলে করে তুলে এনে রাখীর সামনে এসে দাঁড়ায়। এই অবাঙালি ভদ্রলোকটি উপন্যাসের বিশেষ চরিত্র গুজরাতের লেখক দিগন্ত। শুধু মালশ্রী নয়, মা-র নানা উপন্যাসের শিশুচরিত্রগুলির মধ্যে আমার শৈশবের দিনগুলিকে ফিরে পাই। অনেক অনেক টুকরো ছবি। এক নিবিড় সম্পর্কে সংগীতের আলাপের মতো যেন সেই সব স্মৃতি!

স্বদেশিযুগের উদ্দীপনা আর অন্যদিকে মাঠ-ঘাট, নদী, বন-প্রান্তর পুতুলখেলার বয়স থেকেই মায়ের মনে লেখিকা হবার স্বপ্ন জাগিয়েছিল। বিয়ের পর স্বামী শান্তিময় রায়ের অধ্যাপনার চাকরিস্থল যশোহরে, অধুনা বাংলাদেশে, বসে মা ওঁর প্রথম উপন্যাস 'সৃজন' লিখতে শুরু করেন ১৯৪৫ সালে। তখন ওঁর সাতাশ বছর বয়স। সেখানে বহু সাম্যবাদী বিদেশি সৈনিকরা বাবার কাছে আসতেন, যাদের হাতে পাওয়া ইলিয়া ইরেনবুর্গের 'ফল অব প্যারিস' ও অন্যান্য কিছু দুষ্প্রাপ্য বই নতুন করে মায়ের লেখিকা সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। সেই প্রথম, উপন্যাসে বহু রাজনৈতিক ঘটনা দেখা যায়—কাঁথিতে সত্যাগ্রহের বর্ণনা, জেলের ভেতরে চট্টগ্রামের শহিদদের উদ্দেশ্যে শহিদদিবসের ছবি, কলকাতার বুকে মেথর ধর্মঘটের বর্ণনা, বন্দিমুক্তির দাবিতে আন্দোলন, অনশন, হরতাল এবং শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ছবি, কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদির বিবরণী। এই ভাবে বাংলার এক মহিলার কলমে প্রকাশ হতে থাকে একের পর এক রাজনৈতিক উপন্যাস—সমকালীন ইতিহাস, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজ। প্রত্যেকটি উপন্যাসে যেমন রয়েছে প্রাক্ স্বাধীনতা সমাজ ও আন্দোলন দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবনের লড়াই এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে জনজীবনের নানা চড়াই

উতরাই, তেমনি প্রেম-ভালোবাসা, রোমান্টিকতা, ব্যক্তি জীবনের নানা ধরনের টানাপোড়েন।

শিশু বয়সে মাকে লিখতে দেখতাম, সংসারের হাজার কাজের ফাঁকে ফাঁকে। কী লিখতেন, সেটা বোঝবার বয়স ছিল না। আমাদের পুরনো বাড়ি 'কুসুমিকা' যাদবপুরের গড়ফা রোডের ওপরে, সেখানে ছিল নানা লোকের আনাগোনা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মায়ের প্রথম প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্সের গিরীন চক্রবর্তী, কমিউনিস্ট নেতা পূরণ চাঁদ যোশী, কল্পনা দত্তের পরিবার, কেরালার ফোটোগ্রাফার গোভিন্দ বিদ্যার্থী (যাকে আমি ওঁর আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনের নামেই ডাকতাম) অর্থাৎ আমার শর্মাকাকা এবং আমার সেজোমামা শিবপ্রসাদ সেনের সেই সময়কার ছাত্রবন্ধুরা, যারা ওই নিরিবিলি এলাকায় মিটিং করতেন এবং আমি তাদের মধ্যে বসে থাকতাম। এ ছাড়া সদ্য উদ্বাস্তু হওয়া আমাদের বহু আত্মীয় আসতেন, যাদের আমার বয়সি ছেলেমেয়েরা সারাদিনের জন্য আমার খেলার সাথী হয়ে উঠত। মনে পড়ে বরুণাপিসিকে, যিনি কিছুদিন পর যাদবপুরে টিবি হাসপাতালে নার্সের চাকরি পান। বড়ো হয়ে জানতে পারি, মা-র 'পাকা ধানের গানে'র দেবকী চরিত্রের অতীত জীবনের সঙ্গে ওনার জীবনের মিল রয়েছে। এছাড়া চারপাশে সদ্য আগত উদ্বাস্তু পরিবারের দু-একজন আমার শৈশবের বন্ধু হয়ে উঠল—ফোটোর অ্যালবামে তারা থেকে গেছে।

মনে পড়ে মা-র হাত ধরে, 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে' বলতে বলতে গড়ফার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরতাম। দুপাশে কচুবন, কোন বসতি ছিল না। মনে পড়ে মাঝে মাঝে মা-র সঙ্গে বেহালায় যেতাম, যেখানে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত আমার দাদামশায়কে নিয়ে দিদিমা ছোটোমামাদের সঙ্গে থাকতেন, অর্থাৎ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের ফরিদপুরের পালংগ্রামের ভিটেমাটি ছেড়ে এসে। সেখানে এবং পরে হেদোর কাছে গোয়াবাগানে মামাবাড়ি যেতাম—সেখানে বড়ো আকর্ষণ ছিল আমার সমবয়সি মামাতো ভাই উদয়ন, ডাক নাম বাবু। খেলার সাথী সব সময় পেয়েছি একমাত্র কন্যা হওয়া সত্ত্বেও। আমার শিশু বয়সের দিনগুলি মনে করে বহু পরে মা আমায় এক চিঠিতে লেখেন, 'তোমাকে পেয়ে আমার ভিতরে মাতৃসত্তা ও শিল্পীসত্তার গঙ্গাযমুনার দুটি মিলিত ধারার আনন্দস্রোত বয়ে যেত। আনন্দে ভরপুর থাকতাম পাঁচটি বছর—আমার কঠিন অসুখ হওয়ার আগে পর্যন্ত, ছোটোদের পার্কে যেতাম। বাসে বাসে ঘুরতাম। ঘরে বসে কত বক-বক করতাম ও শুনতাম। আর এখানে তখন গাড়ির ভয় ছিল না—তাই তুমিও আপন মনে আরফান কলোনিতে, মাঠে বেড়াতে।' সেই ছিল মা-র সঙ্গে আমার শৈশবের প্রথম পাঁচ বছর। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় কলকাতায় বুদ্ধিজীবীদের এক বিখ্যাত আড্ডা ছিল ধর্মতলার 'কমলালয়' চায়ের দোকানে। একদিন সেখানে মা ও বাবার সঙ্গে চপ খেয়ে বাড়ি ফিরে বুঝলাম, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। বাড়ি ফেরার পথে মায়ের গলা দিয়ে রক্ত ওঠে। চার-পাঁচ বছরের শিশু হলেও বুঝতে পারি কোন বিপদ হয়েছে। পরে শুনেছি, আমি নাকি বার বার বলছিলাম, 'মা, ওই চপ খেলে কেন?' শিশু মনের অবুঝ উদ্বেগ তাতেই ধরা পড়ে। এর পরই যোশী দম্পতি আমাকে তাঁদের কাছে

নিয়ে যান। পি সি যোশী ছিলেন আলমোড়া পাহাড়ের লোক। তাঁর পরিবারে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকে মারা গেছেন। তিনি তাই ওই ছোঁয়াচে রোগ থেকে দূরে রাখতে আমাকে ওঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ওঁদের দুই ছেলে আমারই সমবয়সি সূরয ও চাঁদ আমার খেলার সাথী হয়ে উঠল। আমার দেখা শোনা করতেন কল্পনামাসির ছোটো বোন চুনীমাসি। আজ ওরা কেউ নেই। তবু ওদের থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি, সময়ে অসময়েও আজও মনে পড়ে। এই প্রথম দীর্ঘ দিনের জন্য মাকে ছেড়ে থাকবার কষ্ট ওদের সান্নিধ্য ভুলে থাকতে সাহায্য করে।

মাকে ছেড়ে থাকবার সেই বেদনা মেয়েদের জীবনে যে একদিন আসে, সে কথা বুঝলাম নিজের বিবাহের পর। আজন্ম শৈশবের ঘর ছেড়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে আসা মেয়েদের চিরন্তন কাহিনি। কাছে থেকে যা বুঝিনি, দূরে থেকে যেন হাজারো স্মৃতি ভিড় করত। মনে পড়ে, আমার শৈশবে মা নিজের মনে তৈরি করা কত গল্প বলতেন, কখনও আমাকে খাওয়াতে খাওয়াতে, কখনও বা ঘুম পাড়াতে গিয়ে। হাঁস, মুরগি, বাঁদর ইত্যাদি নিয়ে গল্পের ছলে মন ভোলাবার জাদু জানতেন। পরে শেষ বয়সে লেখা মা-র ছোটোদের জন্য রূপকথা 'হলদে ঝোরা' পড়ে সেই লেখিকাকে খুঁজে পাই, যিনি শিশুমন নিয়ে ভাবতেন এবং বুঝতেন। শিশুদের পড়ানো ছিল মা-র জীবনের আরেকটি স্বপ্ন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিটি পাশ করবার আগে মাদারীপুরে এবং পরে মুন্সীগঞ্জে ও কলকাতাতেও শিক্ষিকার কাজ করেন। শিশুকন্যাকে ঘরে রেখে চাকরি করার সমস্যা দেখা দিল। একবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে (তখন আমরা দক্ষিণ কলকাতার মহানির্বাণ রোডে) দেখেন, আমি হামাগুড়ি দিয়ে দরজার বাইরে প্রায় রাস্তার কাছে আর আমাকে দেখবার জন্য মহিলাটি দিবানিদ্রায়। প্রাত্যহিক জীবনের এই সংগ্রাম তাঁর মাতৃসত্তাকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করল। পরেও শারীরিক অসুখের কারণে শিক্ষকতার জীবনে মা আর ফিরে আসতে পারেননি। ছোটোদের জন্য বাংলা শেখার বই 'লেখার খেলা' ওঁর শিক্ষিকা-মনের স্বকীয়তার পরিচয় বহন করে। এছাড়া শিশু শিক্ষা বিষয়ে নানা প্রবন্ধও লিখেছেন।

শিশুমনের গঠন নিয়ে ওঁর ছিল নানা ভাবনা চিন্তা। সর্বদা মা সমাজের নীচের তলার মানুষদের ছবি আমাকে শিশুবয়সেও দেখাবার চেষ্টা করতেন। যেমন শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তু ছিন্নমূল পরিবারের শিশুদের মুখগুলি। উত্তর কলকাতায় যাতায়াতের পথে আমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতেন অজস্র উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রামের দৃশ্য। অনেক পরে এর মূল্য বুঝতে পারি। শেষ বয়সে সেই ভাবনা থেকেই চিঠি লিখতেন একেবারেই শিশু নাতিকে, যা পরে প্রকাশিত হয় ছোট্ট একটি গ্রন্থে—'নীল চিঠির ঝাঁপি', যেখানে ওই সব অনাদৃত মানুষের ছবিগুলি তুলে ধরেছেন। 'মিঠিসোনা, তুমি যখন বড়ো হয়ে স্কুলে পড়বে, ওই ভিখিরি শিশুদের চাইতে নিজেকে বড়ো মনে করো না। যারা বাড়ির আবর্জনা থেকে ছেঁড়া পুরানো কাগজ কুড়িয়ে নিচ্ছে একাগ্রমনে, কেউবা বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে শুকনো ডালপালা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, শীতের রাতে ওদের শীর্ণ কঙ্কাল হাতগুলি গরম করবে বলে আর ওদের মায়েরা রুটি সেঁকবে যে ধোঁয়াটে আগুনে তিন ইটের

উনুনে খোলা প্ল্যাটফর্মের এক কোণে।' চিঠিটা শেষ করেছেন—'তবু তুমি নিজেকে ওদের চাইতে বড়ো মনে করো না। এমন দিন যদি কখনও আসে, ওদের সঙ্গে মানবতার প্রতিযোগিতায় (যার নাম প্রগতি) নামতে হয়েছে তোমাকে পৃথিবীর ময়দানে, হয়তো দেখবে, তুমি পিছিয়ে আছ অনেক পিছনে। ওদের চোখে জয়ের স্নিগ্ধ হাসি।

সে দিনটার কথা ভেবে ওদের আজ থেকেই ভালোবাসতে শুরু কর। হাতের দস্তানা খুলে হাতে হাত মিলিয়ে দোস্তালি কর ওদের সাথে আজই।'

আমার শিশু বয়সের স্মৃতিগুলো এখন বহু দূরে। তবে কিশোরী বয়সে বুঝতে পারি ঘরে বসেই মা কিছু করছেন, যার জন্য দেখতে পেতাম কোনো কোনো খবরের কাগজে পত্রপত্রিকায় মা-র প্রকাশিত উপন্যাসের ওপর আলোচনা সামান্য হলেও একটু জায়গা করে নিচ্ছে। মা-র শরীরের জন্য হাওয়া বদলে যাওয়া হয়, প্রথমে গোপালপুরের সমুদ্রতটে। তার ছবি দেখতে পাই 'মালশ্রী' উপন্যাসে। ওই বালুতটেই মা-বাবার সঙ্গে আলাপ হয় এক অধ্যাপক দম্পতির, সুকুমারী ও অমল ভট্টাচার্যের, যাঁরা মা-র লেখিকা সত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ওঁদেরই ছোট্ট মেয়ে মুনিয়া হয়ে উঠল আমার খেলার সাথী। এমনি করে দু-এক বছর পর যাওয়া হয় পাহাড়ি এলাকা মুসৌরীতে। সে হল পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। মা-র মনে তখনো দ্বিধা, একদিকে কমিউনিষ্ট পার্টি মা-র লেখা তৃতীয় উপন্যাস 'স্বরলিপি'র ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, অন্যদিকে শারিরীক অবনতি; তাই কুণ্ঠা—লিখে তো আর রোজগারের পথ নেই। মুসৌরিতে মা-বাবার সঙ্গে আলাপ হয় ওই চত্বরে থাকা প্রতিবেশী বিশিষ্ট হিন্দী কথা সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। লেখাকে পেশা করতে তিনিই মাকে উৎসাহিত করেন। মা-র লেখিকা সত্তাকে তিনি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন সকালে নানা ধরনের বাদাম বাটার এক গেলাস সরবত করে এনে দিতেন মা-র শরীরের উন্নতির জন্য। এ কথা মা চিরকাল মনে রেখেছেন। ওঁর লেখা হিন্দী উপন্যাস যে কটি উপহার দিয়েছিলেন, সেগুলি সযত্নে মা রেখে দিয়েছিলেন। ফিরে এসে মা আবার কলম ধরেন—চাকরি করতে না পারার কুণ্ঠা এরপর অনেকটা কেটে যায়।

ইতিমধ্যে আমার পড়াশুনোর তাগিদায় যাদবপুর ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় কয়েক বছরের জন্য বাসা নেওয়া হয়। সেখানে থাকি গোপালপুরের সেই মুনিয়াদের প্রায় পাশের বাড়ি। যে মুনিয়া পরে হয়ে উঠল মা-র লেখার গুণমুগ্ধ পাঠক ও আলোচক, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক তনিকা সরকার। আমি আমার খেলার সাথী ফিরে পেলাম। ওই ছোট্ট ফ্ল্যাটে কতলোকের আনাগোনা—যোশী পরিবার ও শর্মাকাকা ছাড়া গোপাল হালদার ও স্ত্রী অরুণা মাসি, যিনি ছিলেন মা-র একসময়ের সহপাঠী, গিরীন চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবার, শর্মাকাকার শিল্পকলা জগতের বন্ধুরা, যেমন মণিপুরের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সূর্যমুখী। এরপর মায়ের 'মালশ্রী' পড়ে আসতেন। মিত্রালয়ের প্রকাশক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, যিনি মা-র 'পাকা ধানের গানে'র তিন খণ্ড ও 'মেঘনা পদ্মা'র দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। তখন অবশ্য আমরা যাদবপুরের পুকুরের ধারে নতুন বাড়িতে ফিরে গেছি। বাবা আমহার্স স্ট্রিটের সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে প্রতিদিন উত্তর কলকাতায় যেতেন।

তাই বাবা নিয়ে যেতেন মা-র হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি কলেজপাড়ায় প্রকাশকের কাছে। দিনের শেষে আগের দিনের প্রুফ নিয়ে ফিরতন। সারাদিনের প্রাত্যহিক কাজ সেরে রাতের মধ্যে প্রুফ সংশোধন করে বাবার হাতে পরের দিন মা পাঠিয়ে দিতেন মুদ্রণের জন্য। এরই সঙ্গে ভোর হতেই মধ্যবিত্ত সংসারের হাজারো সাংসারিক কাজ—আমাকে তৈরি করে স্কুলে পাঠানো থেকে শুরু করে নিপুণভাবে ঘর সামলানো। তবে লেখিকাসত্তার সঙ্গে গৃহিণীসত্তা বা মাতৃসত্তার দ্বন্দ্ব মাকে লাগাতর পীড়িত করেছে। পিঠে-পায়েস-পুডিং থেকে শুরু করে জ্যাম-জেলি, আচার, ডালের বড়ি ইত্যাদি সবই করতেন। রন্ধনশৈলীতে দক্ষ ও নিপুণ ছিলেন। কিন্তু রাঁধার পর খাওয়া এবং খাওয়ার পর রাঁধা, এ জীবন উনি পছন্দ করতেন না।

সংসারের কাজের অফুরন্ত দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে মা সময় বার করে নিতেন লেখার জন্য। অপরাহ্ন থেকে সায়াহ্ন—এই ছিল মা-র লেখার সময়। মেঝেতে মাদুর পেতে বা তক্তপোষের ওপর ছোট্ট একটা ডেস্কের (যেটি প্রথমযুগের প্রকাশক গিরীন চক্রবর্তীর স্ত্রী রানী চক্রবর্তী মাকে উপহার দিয়েছিলেন।) ওপর রেখেই ওঁর অধিকাংশ লেখা। পরে ছোট্ট একটা টেবিলের ব্যবস্থাও করেন। লেখার জন্য মানসিক পরিবেশ তৈরি করতে টেপরেকর্ডে (যেটা শর্মাকাকা, অর্থাৎ গোভিন্দ বিদ্যার্থী আমাদের উপহার দেন) উচ্চাঙ্গ সংগীত চালিয়ে মা কলম নিয়ে বসতেন। (পঞ্চাশ দশকের শেষে বা ষাটের দশকের একেবারে গোড়া থেকে গোভিন্দ বিদ্যার্থী দিল্লিতে সংগীত নাটক একাদেমিতে উঁচু পদে কর্মরত ছিলেন। তাই ওঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছিলাম সংগীতের বিরাট ভান্ডার। মণিপুরে কর্মসূত্রে যাতায়াতের পথে আমাদের বাড়িতে দু-একদিন থেকে যেতেন। পেশায় ফোটোগ্রাফার। তাই শৈশবের আমাদের অধিকাংশ ফোটো ওঁর তোলা। মা-র যে ফোটোটি সর্বত্র দেখা যায়, সেটিও ওঁর তোলা। এছাড়া নানা জায়গায় শিল্পীদের, সাধারণ মানুষের বহু ফোটো দিতেন, যা মা সে যুগে এ্যালবামে গুছিয়ে রাখতেন। পি.সি. যোশী ও গোভিন্দ বিদ্যার্থীর বন্ধু হিসাবে বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার সুনীল জানাও আসতন। তাঁর তোলা ফোটো আমাদের অমূল্য সম্পদ। সংসারের কাজের মধ্যে মাকে দেখতাম হঠাৎ এসে খাতা খুলে একটা লাইন বা দু-একটা শব্দ লিখে আবার রান্নাঘরে ফিরে গেলেন। কোন একটা বিশেষ চিন্তা বা ভাবনা যেন মন থেকে হারিয়ে না যায়। এখনও কত খাতা পড়ে রয়েছে—এলোমেলো লেখা, কাটাকুটি ছড়ানো পাতায় পাতায়। ঘরের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছেন বিস্তৃত ক্যানভাসের পটভূমি। ধারাবাহিকভাবে লিখতেন না, বরং নিজের মানসিক প্রেরণায় এলোমেলো লিখে, পরে সম্পাদনা করে সাজাতেন প্রায় ফিলম editing-র মতো। দোয়াতের কালি ভরে এবং xerox এর চল না থাকায়, প্রায়শই আগাগোড়া কপি করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেন। মনের জগতে চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। সন্ধ্যারাতে খোলা বারান্দায় কিংবা ঘরের ভেতরেই খুব পায়চারি করতেন। মনে হতো নানা ভাবনার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। রেডিও-তে রাত সাড়ে ন-টার পাশ্চাত্যসংগীতের পিয়ানো, বেহালা ইত্যাদি নিয়মিত শুনতেন। জ্যোৎস্না রাতে খোলা